Downloaded from: justpaste.it/8acdc

ইতিহাসের পাতা থেকে

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস

কালাম আহমদ মোর্তাজা

==========

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাওলানা শরিয়তুল্লাহঃ- পূর্ব বঙ্গে মাদারীপুর গ্রামে শরিয়তুল্লার জন্ম হয়। তাঁর বাবা মা যে খুব ইসলাম দরদী ছিলেন, তাঁর নামই তার সাক্ষি। আঞ্চলিক পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে মাও লানা বাশারত আলীর কাছে যুবক শরিয়তুল্লাহ উচ্চ শিক্ষা নিতে থাকেন। ঐ মাও লানা সাহেব ছিলেন হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী সাহেবের ভক্ত এবং একজন গুপ্ত যোদ্ধা। সুতরাং জিহাদের মন্ত্র দিতে ও নিতে কারও কোন বাঁধা ছিল না। তারপর গুরু-শিষ্য মক্কা গেলেন। সেখানে আরও উচ্চ শিক্ষা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত পন্ডিত তাহের সোম্বালের নিকট সুফিতত্তের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মিশরের আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বঙ্গদেশে মাও লানা শরিয়তুল্লাহ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এসে উপস্থিত হন। ওদিকে হজরত আহমদ বেরেলী বঙ্গদশের জন্য এই রকম রত্নেরই তখন খোঁজ করছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় দুজনের যোগাযোগ হয় এবং তাকে কাজ সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। মাও লানা শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেনীর বিরুদ্ধে লড়াই ও ইংরেজের সঙ্গে লড়াই মনে করে শোষিত, অত্যাচারিত কৃষক, তাঁতী, তিলি প্রভৃত অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেন। এটা খুব মনে রাখা দরকার যে, তখন মুসলমান জমিদারও কিছু ছিলেন, যারা অনেকেই আন্দোলনের প্রতিকুলে ছিলেন।

ঐ সময় হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান কৃষকদের নিকট কালীপুজা, দুর্গাপুজা ইত্যাদিতে কর আদায় করতেন; যা ইসলাম বিরোধী। শুধু তাই নয়, মুসলমান প্রজাদের জন্য ঈদুল-আজহার পর্বে গরু ব্যবহারও বন্ধ করা হয়েছিল। মাও লানা শরিয়তুল্লাহ পুজায় চাঁদা দিতে মুসলমানদের নিষধ করে এবং গরু ব্যবহার উৎসাহ প্রদান করেন। মোট কথা তিনি ধর্ম সংস্কারকরূপে সংগ্রাম চালিয়ে সংগ্রামের বুনিয়াদ মজবুত করে ফেলেন। সেই সঙ্গে তার ছেলে আলাউদ্দিন আহমাদকে মক্কা পাঠালেন। সেখানে শিক্ষা লাভের পর আলাউদ্দিন বাড়ী ফিরে এলেন এবং পিতার নিকট উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তিনি উপযুক্ত প্রতিনিধিতে পরিণত হলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

মাও লানা আলাউদ্দিনঃ- পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই মাওলানা আলাউদ্দিন (অশুদ্ধ ও গেঁয়ো নাম দুদু মিঞা) স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করলেন। হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র শ্রেনীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রাচীর করেন। আরও বলেন, জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি হিন্দুর উপরও অত্যাচার হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদের তাদের পাশে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান। যদি না যাওয়া হয় তাহলে তা ধর্মের কাজ হবে। তিনি শাসন্তন্ত্র কায়েম করলেন। তাঁর বাহিনী তলোয়ার, সড়কি, তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি বিপ্লবী খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরিভাবে। এই পদে সর্বোচ্চ

স্থানে যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হত 'ওস্তাদজী'। তাঁদের পরামর্শদাতারা দু'জন ছিলেন 'খলিফা'। এমনি ভাবে সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে একটি গ্রাম ইউনিট ছিল। সুপাঃখলিফা একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকতো, তাঁদের দ্বারা নীচ হতে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল [দ্রঃ M. A. khan: History of the Faraidi Movement in Bengal, p. 104-112]।

তাঁরা আদালত বা পঞ্চায়েত গঠন করেন এবং সমস্ত অঞ্চলের বিচার বিপ্লবীরাই করতে থাকেন। মুসলমানদের জাকাত, ওশর ইত্যাদি দাতব্য অর্থ সংগ্রহ করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদ্রাসা মক্তব তৈরী করা, মসজিদ তৈরী করা প্রভৃতি কাজ যাদু খেলার মত চলতে লাগলো। ওদিকে বিপ্লবীদের সুবিচার তখন ইংরেজ-বিরোধিতার নামান্তর। তাঁরা বলেন, পৃথিবীতে জমি জায়গা যা আছে সব ঈশ্বরের। সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেওয়া জুলুম বা অত্যাচার। মানুষ সব সমান, আমাদের কারো উপর তাদের কর্তৃত্ব করবার অধিকার নেই।

এই সুবাদে অমুসলমানরাও অনেকে তাঁদের কাছে কেস করতেন। বিচারও সুক্ষ ভাবে হত। বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেবার ক্ষমতা আলাউদ্দিনের সৈন্য বিভাগের ছিল। শেষে অবস্থা অনুকুলে ছিল দেখে তিনি তাঁর এলাকায় ঘোষনা করলেন; যদি কেউ ইংরেজদের আদালতে বিচার প্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি নিতে হবে। এতে ইংরেজ ব্যবসায়ী বা নীলকরের সাহেবরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, আর জমিদার শ্রেনীও খুব অসন্তুষ্ট হল। কিছু মুসলমানের সহযোগিতায় তাঁরা বলতে লাগলো, 'গরীব ছোটলোকদের' এত মাথায় তোলা অবিচার মাত্র। অবশেষে ইংরেজের স্তম্ভ জমিদার শ্রেনী, হিন্দু বং মুসলমান উভয় শ্রেনীর বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং তা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে [দ্রঃ Proceeding of the judicial Department, O.C,No. 25, 29 May 1843p. 462]।

ইংরেজের ইঙ্গিতে ফরিদপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবার নামে দু'জন বড় জমিদারও মুসলমান প্রজাদের জন্য ঘোষনা করলেন, মুসলমানরা গরু কোরবানী করতে পারবে না, কালী ও দুর্গাপুজায় কর দিতে বাধ্য থাকবে। দাড়ির উপরও কর বসানো হয়, আর নিষেধ করা হয়, কোন মুসলমান বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ না রাখতে। প্রথমে কিছু মুসলমান প্রজা তার অবহেলা করলে জমিদাররা তাদের কঠোর শাস্তি দেন। [দ্রঃ A.R. Mallic, 72-73; M.A,Khan, p.27-28]।

আলাউদ্দিন সাহেব ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কানাইপুরের সিকদার ও ফরিদপুরের জয়নারায়ন জমিদারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ আক্রমণ করে উভয়কে পরাজিত করেন। খুব মনে রাখা দরকার যে, ঐ লড়াই হিন্দু-মুসলমানের নয় বরং কৃষক-জমিদারের লড়াই, অথবা ইংরেজ শাসকের শোষনের বিরুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবীদের সংগ্রাম। এরপর কানাইপুরের জমিদার আলাউদ্দিনের দাবি মেনে নেন এবং নিজে ভুলের জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ন বাবু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রবল ভাবে বিপ্লবীদের বাধা দেন; ফলে যুদ্ধ তুমুল রূপ নেয়। শেষে বিপ্লবীরা জমিদারের ভাই মদন বাবুকে ধরে নিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় এবং পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করা হয় [দ্রঃ M.A. Khan, p.27-29]। ঐ হামলায় ৮০০ জন মুসলমান বিপ্লবী যুক্ত ছিলেন। জমিদাররা ইংরেজের আদালতে মামলা করলে বিচারে ২২ জনের ৭ বছর করে জেল হয়। আলাউদ্দিনের অবশ্য কোন শাস্তি হয়নি; তিনি মুক্তি পান। অনেকের মতে এও ঠিক যে, তাঁর শাস্তি হলে হিতে বিপরীত হত। কেননা পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী ঐসময় আলাউদ্দিনের হাতে আশি হাজার লোক প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। [দ্রঃP. J.D.O.C No. 99,7.4. 1847, p. 146]।

১৮৪১ ও ৪২ এর ঘটনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে জমিদারগণ লড়াই করতে সাহসী হননি। তবে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করা এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জমিদারের সঙ্গে শোষিত মানুষের বা কৃষকের লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়ীক লড়াই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। অমলেন্দু তাঁর উল্লেখিত পুস্তকের ৭৪ পৃষ্টায় লিখেছেন জমিদারগণ অনেকাংশে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলেন।

লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বলে সাধারণ মানুষকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল।

ঐ সময়ে ডানলপ সাহেব ছিলেন কাসিমপুরের নীলকুঠির প্রভাবশালী সাহেব। ঐ ইংরেজের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ছিলেন কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলাল নামক এক গোমস্তা। ডানলপ সাহেব এবং ঐ ব্রাহ্মন গোমস্তা আট শত সশস্ত্র লোক নিয়ে বাহাদুরের দুদু মিঞার বাড়ী আক্রমণ করেন। বাড়ীর চার জন প্রহরিকে হত্যা এবং বহু ব্যাক্তিকে আহত করে সেই বাজারের দেড় লক্ষ টাকার অর্থ ও সম্পদ নিয়ে ফিরে যান। [দ্রঃ M.A.Khan, p. 35; অমলেন্দু দে পৃষ্ঠা ৭৫]

১৮৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর আলাউদ্দিন প্রতিশোধ নিতে ডানলোপ সাহেবের কুঠির আক্রমণ করেন। পরে সেই গোমস্তাকে বাখরগঞ্জ এলাকায় অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করা হয় এবং তাদের ২৬ হাজার টাকার ক্ষতি করে দেওয়া হয়। অধ্যাপক অমলেন্দু দে'র ভাষায়- "তাঁদের তুলনায় ডানলপের ক্ষতির পরিমাণ অল্পই ছিল।" [দ্রঃ অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা ৭৫]

সেই সময়কার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন দানলপের বন্ধু। সেই সুবাদে অনায়াসে ডানলপ কোর্টে কেস করলেন। আলাউদ্দিন এবং ৬৩ জন মুসলমান বিপ্লবীকে বন্দী করে বিচার চলতে থাকে। বিচার সকলের শাস্তির রায় হয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা হয়। চতুর ইংরেজ অবস্থা বুঝে সকলকেই মুক্তি দেয়। ১৮৪৭ সালে মুক্তি পেয়ে আলাউদ্দিন সারা ভারতে প্রত্যক কেন্দ্রে সংবাদ পাঠান যে, চারিদিক হতে এক সঙ্গে ইংরেজ-ধ্বংস অভিযান চালাতে পারলে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে। গোপনে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, সারা ভারতের আন্দোলন ও বিপ্লবকে ইংরেজ তার সৈন্য বাহিনী দিয়েই দমন করছে, সুতরাং সৈন্যদের কোন প্রকারে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভয়াবহ রুপ নেবার পূর্বেই সরকার টের পায় যে, নেতা আলাউদ্দিনকে জেলে দেওয়া ছাড়া পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই তাঁকে বন্দি করে জেলে খুব অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের ইন্ধন করা হয়। শরীর দুর্বল এবং অসুস্থ থাকলেও মন আর মস্তিস্ক কিন্তু দুর্বল হয়নি একটুও। তাঁকে ছাড়া হয়েছিল ১৮৬০ সালে। শুধু ভয় করেই এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই যে ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দি করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। [M.A.Khan, p.42-43]

অনেকে মনে করেন, এই রকম এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নেতা যদি স্বাধীনভাবে ছাড়া থাকতেন তাহলে বিপ্লপবের রূপরেখার প্রভুত পরিবর্তন হত; আর সেই জন্যই ইংরেজ তাকে বন্দি করে প্রায় পাঁচ বছর আটক রাখে। দু'বছর তিনি জেলের বাইরে বেঁচে থাকলেও জেলের অত্যাচারের জের টানতে হয়েছিল শেষ জীবন পর্যন্ত। ১৮৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী মাওলানা আলাউদ্দিন বাংলারই মাটিতে চিরনিদ্রিত হন। আজকের নিষ্ঠুর ইতিহাস যেন ভুলে গেছে সেই বিপ্লবীর কথা।

আলাউদ্দিনের পুত্রদ্বয়ঃ আলাউদ্দিন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য পুত্র গিয়াসুদ্দিন হায়দার সামরিক নেতা হিসাবে বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তাছাড়া তাঁর আর এক ভাই আব্দুল গফুরও পুরোপুরি ভাবে বিপ্লব ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এই ইতিহাস বিখ্যাত আব্দুল গফুর নামটাকে ইংরেজ ও তাদের অনুসারীরা তার অখ্যাত নাম 'নোয়ামিঞা' বলে উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্দ্র সেন তার আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে গফুর সাহেবের জন্য অত্যন্ত বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গ করে যা লিখেছেন তাতে ভারতবাসীর ঘৃণায় মাথা নিচু হয়ে যাবার কথা। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে তা হলো, এরা বংশানুক্রমিক ভাবে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে পার্থিব ধ্বংসকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এর দ্বারা তাঁদের দেশপ্রীতি ও তেজোদ্দিপ্ত বিপ্লবী মনোভাবের পরিচই পাওয়া যায়। সেই আব্দুল গফুর, গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি নিঃস্বার্থ বিপ্লবীদের আজকের ইতিহাস কতটুকু ধরে রেখেছ? [দ্রঃ অমলেন্দু দে পৃষ্ঠা ৮২]

****